একটি গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার

ও

আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ

প্রেক্ষিত ঃ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১

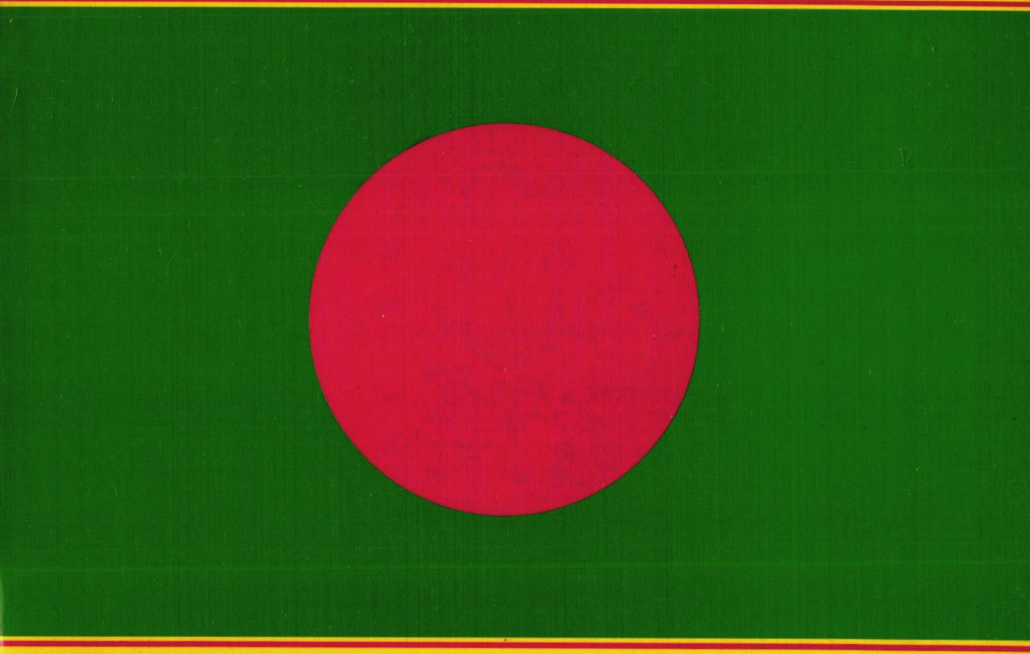

মোকাররম হোসেন কবীর

বীর মুক্তিযোদ্ধা (ম-১৬৩৯)

সার্বিক সহযোগীতায়

অধ্যাপক আব্দুল্লাহিল মাহ্‌মুদ (পি.এইচ.ডি. গবেষক)

বার্তা সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক পিরোজপুরের আলো

একটি গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার

ও

আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ

প্রেক্ষিত ঃ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১

লেখক ঃ মোকাররম হোসেন কবীর

বীর মুক্তিযোদ্ধা

সার্বিক সহযোগীতায়

অধ্যাপক আব্দুল্লাহিল মাহ্‌মুদ (পি.এইচ.ডি. গবেষক)

বার্তা সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক পিরোজপুরের আলো

www.pathagar.com

একটি গোয়েবলসীয় মিথ্যাচার

ও

আল্লামা সাঈদী প্রসঙ্গ

প্রেক্ষিত ঃ মুক্তিযুদ্ধ- ১৯৭১

মোকাররম হোসেন কবীর

(বীর মুক্তিযোদ্ধা)

সার্বিক সহযোগিতায়

অধ্যাপক আব্দুল্লাহিল মাহমুদ

(পি. এইচ. ডি. গবেষক)

প্রকাশক

প্রবাহ প্রকাশনী

বাংলাবাজার

ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ

২০০৯ জানুয়ারী

কম্পিউটার কম্পোজ

দুর্জয় কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

মুদ্রণ

স্বদেশ প্রিন্টিং প্রেস,

আরামবাগ- ঢাকা

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ৩০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

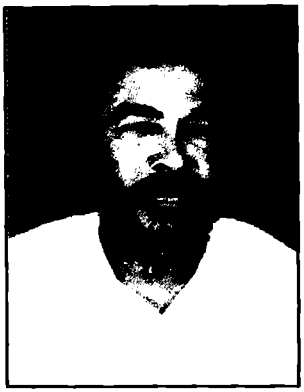

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকাররম হোসেন কবীর বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত জিয়ানগর থানার শঙ্করপাশা ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২১ /০৪/৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম এ. এম. হাসান স্থানীয় পাড়েরহাট রাজলক্ষী হাইস্কুলে অত্যন্ত সুনামের সাথে দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মোকাররম হোসেন কবীর কলেজের ছাত্র থাকাকালে ১৯৭১ সনে সমগ্র দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও দেশের গণমানুষের করুণ চিত্র দেখে তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। হানাদারদের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমাণ্ডার মেজর (অব.) এম. এ. জলিল ও সাবসেক্টর কমাণ্ডার মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদের অধীনে ভারতের বীরভূমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার রায়েন্দায়ে পাকহানাদারদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পাড়েরহাট, পিরোজপুর শত্রু মুক্ত করেন।

অসংখ্য মানুষের জীবন, এক সাগর রক্ত আর অগণিত মা-বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরে তিনি নিজ এলাকায় ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

যে কারণে অত্র পুস্তিকাটি লিখতে হলো

আমার জন্মদাতা সম্মানিত পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম এ. এম. হাসান পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট রাজলক্ষী হাইস্কুলের প্রায় পঁচিশ বছরকাল ধরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সংগ্রহে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি ছিলো এবং নতুন নতুন সাহিত্য সংগ্রহ করা ছিলো তাঁর নেশা। সেই সুবাদে বই পড়ার প্রতি আমার সেই বাল্যকাল থেকে আগ্রহ ছিলো বটে, কিন্তু জীবনে কখনো কোনোদিন পুস্তকাকারে কিছু আমি লিখিনি এবং লিখবো বলে চিন্তাও করিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে পবিত্র কোরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করতে গিয়ে কোরআনের একটি আয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এবং উক্ত আয়াতই আমাকে এই পুস্তিকা লিখতে বাধ্য করলো। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **"তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে পোশাক পরিয়ে দিও না (ঢেকে দিও না) এবং সত্যকে জেনে বুঝে লুকিয়ে রেখোনো।"**(সূরা বাকারা- ৪২)

আমি সরকারী সনদপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৭১ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে পাকবাহিনীর বর্বরতা সহ্য করতে না পেরে তাদের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত- স্বাধীন করার লক্ষ্যে নিজের প্রাণ বাজী রেখে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মোড়েল গঞ্জ, শ্মরণখোলা, মঠবাড়িয়া, ভাণ্ডারিয়া, পাড়েরহাট, পিরোজপুরের তৎকালীন চিত্র ছিলো আমার নখদর্পণে। মরণপণ যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে- বিপক্ষে এই এলাকার কার কী ভূমিকা ও অবস্থান ছিলো তা সবই আমার চোখের সামনে ছিলো।

আজকের বিশ্ব বরণ্যে মুফাস্সীরে কোরআন **আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাড়েরহাট বাজারে তাঁর আপন ভায়রা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মোজাহার আলী মল্লিকের সাথে ব্যবসা করতেন এবং পাড়েরহাট বাজারের ভাঙ্গা একটি টিনশেড্ মসজিদে আমার পিতার সাথে প্রায়ই একত্রে নামাজ আদায় করতেন। অবশ্য এমপি হওয়ার পর সাঈদী সাহেব সে ভগ্ন দশার মসজিদটি সুরম্য পাকা বিল্ডিং করেছেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে তিনি টানা দশ বছর এমপি থাকাকালীন সময়ে পিরোজপুর এলাকায় শতাধিক মসজিদ সুদৃশ্য পাকা বিল্ডিং করেছেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমি **আল্লামা সাঈদী** সাহেবকে একজন মুফাস্সীর, ওয়াজ- নসিহতকারী আলেম হিসেবে চিনতাম। তিনি তৎকালীন সময়ে বরিশাল, খুলনা, যশোর ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ওয়াজ-নসিহত করতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হবার পর সারাদেশে মাহফিল স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। তিনি তখন পাড়েরহাট বাজারে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়টি মাস মাওলানা সাঈদী সাহেব পাড়েরহাট বাজারে ছিলেন। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিলো না। তিনি রাজাকার, আল বদর, আল শামস্ অথবা শান্তি কমিটির কোনো সদস্যও ছিলেন না। এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কও ছিলো না, এ কথা এলাকাবাসী হিন্দু- মুসলিম সকলেরই জানা।

মহান আল্লাহর রহমতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মুফাস্সীরে কোরআন হিসেবে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করেন দেশবাসীর সামনে এবং এক পর্যায়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েন সমগ্র বিশ্বময়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলামী স্কলার হিসেবে তাঁর পরিচিতি মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের জন্যে দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে। তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের গাত্রদাহের সৃষ্টি করে এবং তারা ৮০'র দশকের শেষ ভাগে এসে তাঁকে 'রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী, অগ্নিসংযোগকারী, খুনী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী' ইত্যাদি কল্পনা প্রসূত বিশেষণ লাগিয়ে পত্র- পত্রিকায় এবং টিভি চ্যানেলে নানা ধরনের কল্প- কাহিনী রচনা ও প্রচার করে নতুন প্রজন্ম তথা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়।

এমতাবস্থায় পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াতটি আমাকে এ ব্যাপারে সত্য উদ্ঘাটনে সাহসী ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। পুস্তক রচনায় আমি একেবারেই নতুন বিধায় আমার অত্র পুস্তিকা রচনায় টগড়া- পিরোজপুর কামিল মাদ্রাসার অধ্যাপক পি. এইচ. ডি গবেষক আব্দুল্লাহিল মাহ্মুদ এর সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং এতদসংক্রান্ত বই- পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও জাতিয় সংসদে আল্লামা সাঈদীর রেকর্ডকৃত বক্তৃতা থেকে সহযোগিতা নিয়েছি।

আল্লামা সাঈদীর খোদাভীরুতা, সততা- স্বচ্ছতা, উন্নত নৈতিক গুণাবলী, পরোপকারী কর্মকাণ্ড, মানবদরদী মনোভাব, অমায়িক ব্যবহার ও সাদাসিধা জীবন- যাপনের জন্যে তিনি তাঁর জন্মস্থান পিরোজপুর জেলার হিন্দু, মুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত। তিনি আধুনিক পিরোজপুর গড়ার রূপকার। একটানা দশ বছর তিনি পিরোজপুর-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পিরোজপুরবাসীকে শুধুই দিয়েছেন, বিনিময়ে কানাকড়ি কিছুই গ্রহণ করেননি, এ কারণে অমুসলিম সংখ্যালঘুরাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এমন এক ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অন্যায়ভাবে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত করার প্রতিবাদে আমার এ পুস্তিকা চালেঞ্জ হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

মুক্তিযোদ্ধা মোকাররম হোসেন কবীর

(পাড়েরহাট-পিরোজপুর)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

৭ যুদ্ধাপরাধী বলার প্রেক্ষাপট-১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ

৯ কাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা যায়

১২ স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর সহযোগী শক্তি

১৪ অভিযোগের প্রমাণ কোথায়?

১৫ আওয়ামী লীগের বিগত দুটো সরকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

১৬ যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ও জনগণের ওপর এর প্রভাব

১৬ '৮৮ এর নির্বাচনী ফলাফল কি বলে

১৭ ৩৮ বছর পরে কেনো এই দাবী?

১৯ আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয়

২০ মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা

২২ আল্লামা সাঈদীর নির্বাচন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

২৩ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ও আল্লামা সাঈদী

২৭ পার্লামেন্টে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ

২৮ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর মানহানী মামলা

৩০ মূল পরিকল্পনা দেশের বাইরের

৩১ শেষ কথা

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী বলার প্রেক্ষাপট ঃ ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ

ইতিহাস সাক্ষী, তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী নাগরিকদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের সীমাহীন বৈষম্য, শোষণ, অবজ্ঞা এবং অন্যান্য গর্হিত আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচনে এ দেশের মানুষ পশ্চিমা শোষকদের প্রচন্ড ঘৃণায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রকারান্তরে স্বাধীনতার পক্ষেই গণরায় দিলেছিলো। এতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ কালো রাতে বর্বর হায়েনার মতো নিরস্ত্র বাংলাভাষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সূচনা করা হয় নির্মম গণহত্যার। প্রতিবাদে এদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ মুক্ত- স্বাধীন দেশে স্বাধীকার অর্জনের আশায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক আহ্বানে যার কাছে যা ছিলো তাই নিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ দেশের সকল স্তরের মানুষের অকল্পনীয় ত্যাগ এবং অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রম, মানুষের প্রাণ ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে প্রতিবেশী ভারতের সহযোগিতায় দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বার বিশ্বের মানচিত্রে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' স্বগৌরবে স্থান করে নেয়।

সচেতন মহলের জানা রয়েছে যে, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ধর্মীয় বা চেতনা বিশ্বাসের আন্দোলন বা অন্যান্য যে কোনো আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষেই লোকজন থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পক্ষে থাকে আবার ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিপক্ষে থাকে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের আসামে স্বাধীকার আন্দোলন, পাঞ্জাবের শিখ জনগোষ্ঠীর স্বাধীন খালিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেও আন্দোলন চলছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ আন্দোলনের বিপক্ষে রয়েছে। অপরদিকে কাশ্মিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বাধীনতার দাবীতে দীর্ঘ ৬১ বছর ব্যাপী ভারতীয় বাহিনীর বুটের তলায় রক্ত ঢালছে, শাসকগোষ্ঠী নির্মম- নিষ্ঠুরভাবে উক্ত আন্দোলন দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কাশ্মিরেও ক্ষুদ্র একটি অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনা ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এ ধরনের আন্দোলন শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, চীন, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, লেবানন, ফিলিস্তীন, সুদান, ইরিত্রিয়া, ইথিউপিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া এবং ইউরোপ- আমেরিকার দেশসমূহেও চলছে। একই ধারাবাহিকতায় কলিকাতায় বসে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি চিত্ত রঞ্জন সুতার ও কালীদাস বৈদ্য বাংলাদেশকেও ভেঙ্গে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকেও বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন 'জুমল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে কম বেশী যাই হোক লোকজন রয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠতার

www.pathagar.com

পক্ষেই গনতন্ত্রের অবস্থান। কিন্তু নিজ স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটতে দেখলে গনতন্ত্র পদদলিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপক্ষেই পরাশক্তির অবস্থান গ্রহণ করার ঘৃণ্য দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে, ইরানে বিপ্লব কালে, ফিলিস্তীনে, ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ে, কাশ্মিরে, ইরাকে ও আফগানিস্তানে এবং আলজেরিয়ার নির্বাচনে পরাশক্তির উক্ত ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত জ্বলজ্বল করছে।

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের বহুপূর্ব থেকেই এ দেশের সচেতন জনগোষ্ঠী গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আসছিলেন, বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত কখনোই এ দেশবাসীর সাথে 'বন্ধু' সুলভ আচরণ না করে 'বিগ্ ব্রাদার' সুলভ আচরণ করে আসছে। ১৯৬৫ সনের পাক- ভারত যুদ্ধের পরে তাদের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং এ কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতাকে তারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারত তার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করছে, ভারত কর্তৃক এ দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে– এ বিশ্বাস ও আতঙ্কে তাড়িত হয়েই অধিকাংশ ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব ভারতের সহযোগিতামূলক মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত কর্তৃক এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রমাণও দেশবাসী পেয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের আন্দোলনের বিপক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা অবস্থান গ্রহণ করে, আন্দোলন সফল হবার পরে বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারীদের কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক নিরুপণ করা হয়, কার অবস্থান কতটুকু ক্ষতিকর এবং ক্ষতির মানদণ্ডে কে কতটুকু শাস্তির যোগ্য সেটাও নির্ধারণ করা হয়। এই অবস্থা দেখা গেছে ১৯৭৯ সনে ইরানে। বিপ্লবোত্তর ইরানে সংখ্যালঘিষ্ঠ বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারীদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানও বিশ্বস্বীকৃত সেই একই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ডান-বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক, চাকুরীজীবী, পেশাজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভারতের সহযোগিতামূলক মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করলেও সুযোগ সন্ধানী অনেকেই রাতারাতি খোল-নলচে পাল্টে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক সেজেছেন। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করছেন, জাতীয় কবি ও জাতীয় অধ্যাপকের উপাধিও গ্রহণ করেছেন এবং আওয়ামী লীগের এমপি ও মন্ত্রীসভাতেও স্থান পেয়েছেন। কিন্তু রাম-বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও এক শ্রেণীর মিডিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে এদের কারো নাম উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র জামায়াতে ইসলামী এবং দেশ বরণ্য ইসলামী চিন্তাবিদের নাম কোরাস কণ্ঠে উচ্চারণ করে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী

www.pathagar.com

হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। এমনকি বিশ্বের অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাস্‌সীরে কোরআন **আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** সাহেবকেও তারা যুদ্ধাপরাধীদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। অথচ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে তাঁর সামান্যতম ভূমিকাও ছিলো না এমন কি ১৯৭৪ সালের পূর্বে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীও ছিলেন না।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই আশা করেন অপরাধী যে বা যিনিই হোন না কেনো তার বিচার হোক এবং অপরাধের দণ্ড ভোগ করুক। তবে সে বিচারটি হতে হবে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীনভাবে। একই অপরাধের কারণে কেউ দণ্ডিত হবে আর কাউকে এমপি, মন্ত্রীত্ব এবং অন্যান্য উপাধি দিয়ে পুরুস্কৃত করা হবে, এমন বিচার শক্তিবলে করা হলেও নিয়তির নির্মম নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য দণ্ড থেকে কেউ-ই রেহাই পাবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যে সকল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হচ্ছে, তাদের সকল কর্মকাণ্ড দেশবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট রয়েছে। গত কয়েকটি পার্লামেন্টে জামায়াতের এমপিদের এবং বিগত সরকারের দুইজন মন্ত্রীকে দুর্নীতির ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি, নিজ এলাকায় তারা সাধ্যানুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, অর্পিত দায়িত্ব শতভাগ সততার সাথে পালন করেছেন, এসব বিষয়ে একটি বারও কোনো একটি মিডিয়াতেও উচ্চারণ না করে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে শুধু অপপ্রচারই চালানো হচ্ছে। **আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** সাহেব তাঁর নিজ এলাকায় প্রায় ৪০০ শত কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর প্রাণের দুশমনরাও বলতে পারবে না যে তিনি সরকারী অর্থের একটি টাকাও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করেছেন অথবা তিনি তাঁর চার সন্তানের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে স্বজন প্রীতি করেছেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সততা-স্বচ্ছতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রশংসা না করে প্রচার মাধ্যমগুলো তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধীর কাল্পনিক অভিযোগ তুলছে।

কাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা যায়

আইন মানা হোক বা না হোক সেটি ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে সকল বিষয়েই আইন প্রণয়ন এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুইটি দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলতে থাকে এরই নাম যুদ্ধ এবং পরস্পরের সেনাবাহিনী একে অপরের দ্বারা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। কারণ বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর উভয় পক্ষই যে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তবে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেনো, তা কেবলমাত্র দুই পক্ষের সামরিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে– বেসামরিক লোকজন যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীকে সজাগ থাকতে

www.pathagar.com

হবে। যুদ্ধকালে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত নয়, এমন লোকদের হত্যা করা যাবে না। ধর্ষণ- লুটপাট করা যাবে না এবং বেসামরিক কোনো কিছুতে আঘাত করাও যাবে না। কোনো পক্ষের সেনাবাহিনী যদি আন্তর্জাতিক নীতি লংঘন করে বেসামরিক লোকজনের ওপর গণহত্যা পরিচালিত করে তাহলে তা যুদ্ধাপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীরা গণহত্যা চালিয়েছিলো এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের অনুসন্ধান ও তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এরপর গঠন করা হয় নুরেমবার্গ ট্রায়াল। কিন্তু বড় বড় অপরাধীরা পালিয়ে ছিলো বিধায় তখন সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা যায় নি। পলাতকরা ধরা পড়ার পরই বিচার হয়েছে। কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা ও বসনিয়ায় যে নির্মম গণহত্যা চালানো হয়েছে এরও বিচার হবে বলে জাতিসংঘে উত্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বয়ং বৃহৎ শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে স্বাধীন ইরাক ও স্বাধীন আফগানের অস্তিত্ব তস্‌নস্‌ করলো, তাদেরই ছত্রছায়ায় লেবানন ও ফিলিস্তীনকে অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা জাহান্নাম বানালো এবং এখনো ওসব দেশে দিনরাত নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হলেও এ ব্যাপারে কারো কোনো বক্তব্য নেই। মুসলমান শেষ হোক, মুসলিম দেশ ধ্বংস হোক এ ব্যাপারে পরাশক্তির বশংবদ ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং মিডিয়াগুলোর আচরণ চরম আত্মঘাতী।

যাই হোক, আজকের বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের মানচিত্রে পূর্বপাকিস্তান হিসেবেই গণ্য ছিলো এবং পূর্বপাকিস্তানে যারা নির্মম গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ধর্ষনের মতো ঘটনা ঘটিয়েছিলো তাদের মধ্যে হাতে গোণা কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্বপাকিস্তানের বাংলাভাষীদের মধ্যে যারা অখণ্ড পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্বপাকিস্তানে বসবাসরত উর্দ্দু ভাষীদেরসহ বাংলাভাষীদের মধ্যে হাতে গোণা কিছু সংখ্যক লোককে নিজেদের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলো এবং বাংলাভাষী এসব লোকদেরকেই পরবর্তীতে 'স্বাধীনতা বিরোধী' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লণ্ডন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হলো, উক্ত সরকার যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করে এবং তদন্তের আওতায় ছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহায়ক বাহিনীগুলো। তদন্তের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী ১৯৫ জন সৈন্যকে War criminal act- এর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হওয়া এবং তাদের বিচারের কথা জানিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

সেই সাথে কিছু সংখ্যক উর্দু ভাষী ও বাংলাভাষী প্রায় লক্ষাধিক লোককে কলেবরেটর তথা দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের সম্মুখিন করা হয়। উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কোনো বেসামরিক লোককে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেননি, যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিক।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের সিদ্ধান্ত জানানোর পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারিক ট্রাইবুনালের সম্মুখে হাজির করা হয়নি। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ- ইণ্ডিয়া- পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে এক চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত চুক্তিপত্রে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং, পাকিস্তানের আজীজ আহ্মদ এবং বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করেছিলেন এবং উক্ত চুক্তিপত্র এখন পর্যন্ত মওজুদ রয়েছে। পাক বাহিনীর সহযোগী হিসেবে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো, তাদের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী দালাল আইন জারী করে এ আইনের অধীনে প্রায় ১ লক্ষ লোককে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে ৩৭,৪৭১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্যে ৩৪,৬২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণের অভাবে মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়নি। ২,৮৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হলেও বিচারে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়।

১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর সরকার প্রধান স্বয়ং **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু সাধারণ ক্ষমায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ তথা যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি। এক কথায় মুক্তিযুদ্ধকালে এসব অপরাধ যারা করেছে তাদের বিচারের পথ খোলা রাখা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দালাল আইন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। কিন্তু এর পূর্বে এই আইনের অধীনে ২ বছর ১ মাস সময়ের মধ্যেও হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের তথা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে কারো বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়নি। হয়তবা এ কারণেই রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আইনটিকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে আইনটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন।

স্মরনে রাখতে হবে, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার পরও বিচার না করে ত্রি-রাষ্ট্রীয় সমঝোতার মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছিলো, তারা সকলেই ছিলো সামরিক বাহিনীর লোক, এদের মধ্যে একজনও বেসামরিক লোক ছিলো

www.pathagar.com

না। আর দালাল আইনের মাধ্যমে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাদের সকলেই ছিলো বেসামরিক লোক, এদের মধ্যে একজনও সামরিক লোক ছিলো না। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান স্বয়ং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানই সামরিক ও বেসামরিক বিভাজন রেখা টেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর সহযোগী শক্তি

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে কে কিভাবে এবং কেনো পাকবাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলো এ সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একপেশে তথ্য শুরু থেকেই মিডিয়ার মাধ্যমে জাতিকে শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃত ইতিহাস হলো, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের গণহত্যা শুরু করার পরে এদেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতের সহযোগিতায় যে অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলো, এর মোকাবেলায় পাকবাহিনীর জন্যে সহযোগী শক্তির একান্তই প্রয়োজন ছিলো। এ লক্ষ্যেই তদানীন্তন পাক সরকার পাকসেনাবাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে গঠন করেছিলো আল বদর ও আল শামস্ বাহিনী।

অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত লোকদের দ্বারা গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের আদলে গঠন করা হয়েছিলো রাজাকার বাহিনী এবং এ বাহিনী ছিলো সম্পূর্ণ পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। এ বাহিনীতে সকলের প্রবেশ অবাধ ছিলো বিধায় দলমত নির্বিশেষে অপরাধী, সুযোগ সন্ধানী বেকার লোকজন এ বাহিনীতে যোগ দিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নানা অপরাধে নিজেদের জড়িত করেছিলো।

১৯৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের পর এদেশে বসবাসরত সকল মানুষের পক্ষে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না এবং ভারতের পক্ষেও সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দেয়াও ছিলো অসম্ভব। ভারতে যদি সে সময় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষও আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তাহলে অবশিষ্ট সাত কোটি মানুষ পাকবাহিনীর খড়গের নীচে দিনরাত মৃত্যু আতঙ্কে তাড়িত হয়ে এদেশেই বসবাস করতে হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পাক সরকার ও প্রশাসনের আনুগত্য করতে হয়েছে।

যেমন প্রয়াত কবি শামসুর রহমান, তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত চাকুরে ছিলেন এবং তিনি নিয়মিত উক্ত পত্রিকায় মুক্তিবাহিনীকে দুষ্কৃতকারী বলে উল্লেখ করে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক কিছুই লিখতেন। শহীদ জননী হিসেবে পরিচিত প্রয়াত জাহানারা ইমাম এবং অধ্যাপক কবির চৌধুরী সেই সময় নিয়মিত রেডিও পাকিস্তানে কথিকা পাঠসহ নানা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারে যাকে ধর্মপ্রতিমন্ত্রী করা

www.pathagar.com

হয়েছিলো, সেই নূরুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন রাজাকারের কমাণ্ডার। বর্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বিয়াই ছিলেন ফরিদপুরের শান্তি কমিটির নেতা। আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীর পিতা ছিলেন রাজধানী ঢাকার শান্তি কমিটির নেতা। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলামের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও আওয়ামী লীগ তাকে জাতীয় নির্বাচনে নমিনেশন দিয়েছিলো। শুধু আওয়ামী লীগেই নয়, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ অনেক দলের বর্তমান নেতৃবৃন্দের কারো কারো ভূমিকা তদানীন্তন পাকবাহিনীর পক্ষে ছিলো।

সে সময় দেশে ছোট বড় যে রাজনৈতিক দল ছিলো, পাক সরকার তাদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয়নি এবং ঐ পরিস্থিতিতে কোনো দলের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবও ছিলো না। আর দেশে অবস্থান করে বিপক্ষে গেলে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে আসতো তা কল্পনা করলেও দেহ শিউরে ওঠে। সুতরাং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ১৯৭১ সালে দেশে অবস্থানরত বহু সংখ্যক মানুষকেই পাকাবাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, ১৯৫ জন চিহ্নিত প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিয়ে সসম্মানে পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠিয়ে সহযোগী শক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে, পাকিস্তান সরকারের অনুগত আমলা, কবি-সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, চাকুরীজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসকসহ অন্যদেরকে সম্মানজনক আসনে বসিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বলয়ভুক্ত লোকদেরকে কেনো স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে টার্গেট করা হচ্ছে?

১৯৭১ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জামায়াতে ইসলামীর হাতে ছিলো না এবং ২৫শে মার্চের পরে ভারত সরকার কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের লোকদের সাথেই ভালো ব্যবহার করেছে। এমন কি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি। তিনি চীনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আনার জন্য চীন যেতে চাইলে তাকে ভারতে গৃহবন্দী রাখা হয়। সুতরাং ভারত সরকার জামায়াতের মতো একটি ইসলামপন্থী দলের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এটা কল্পনাও করা যায় না।

পরিস্থিতি যখন এই তাহলে জামায়াতের লোকদের পক্ষে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় পাবার কল্পনাও তারা করেনি। বাস্তব অবস্থার কারণে এ দলটি যদি সে সময় নিরপেক্ষ থাকতো তবুও পাক সরকার তাদেরকে রেহাই দিতো না।

একান্ত বাধ্য হয়ে জামায়াতে ইসলামীর যেসব লোকজন অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে প্রচার চালানো হয়েছে যে, তারা হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, গুম ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছেন। সত্যই যদি তারা এ সকল অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে তদানীন্তন সরকার প্রধান স্বয়ং মরহুম শেখ মুজিবর রহমান যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কেবলমাত্র ১৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করেছিলেন কেনো? বরং তাদেরকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত না করে দালাল আইনে গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো এ সত্যই উন্নত রেখেছিলেন যে, জামায়াত নেতৃবৃন্দ কেউ-ই যুদ্ধাপরাধী নন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিলে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করেছিলেন। বিজয়ী পক্ষ ছিলেন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরা এবং পরাজিতের পক্ষে ছিলেন পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী। এই দলিলের কোথাও 'মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী বা বাংলাদেশ সরকার' শব্দের উল্লেখ নেই। কোনো বাংলাভাষীকে সাক্ষী হিসেবেও রাখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকেও আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি। প্রশ্ন হলো, ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী না জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ? আত্মসমর্পণের দলিলই তো প্রমাণ করে যুদ্ধাপরাধী ছিলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, জামায়াত নেতৃবৃন্দ নয়।

১৯৭৪ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মরহুম শেখ মুজিবর রহমান অধিকাংশ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে এ কথাই সত্য বলে প্রমাণ হয়েছিলো যে, তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে দুই একজনকে ছাড়া হয়নি পরবর্তীতে কোর্টের রায়েও তারা অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হননি বিধায় তাদেরকে কোর্ট মুক্তি দিয়েছিলো। এ সকল নথিপত্র এখন পর্যন্ত মওজুদ রয়েছে এবং এ সত্য কখনো মুছে দেয়া যাবে না। প্রকৃত সত্য যখন এই তাহলে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে কেনো যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে?

অভিযোগের প্রমাণ কোথায়?

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়। জামায়াতের যে সকল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাদের একজনও কি উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন? তারা যদি কোনো ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত হতেন, তাহলে তাদের এলাকার লোকজন কি তাদেরকে নিজ এলাকায় প্রবেশ করতে দিতো? তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একজন মানুষও কি তাদের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের পরে দেশের একটি থানাতেও মামলা দায়ের বা সাধারণ ডায়েরী করেছেন? দেশের কোথাও কি এর একটি দৃষ্টান্ত আছে?

কল্প-কাহিনী রচনা করে জাতিকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা যায়, নতুন প্রজন্মের সম্মুখে মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করানোর অপচেষ্টা করানো যায়, কিন্তু যাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধাপরাধের এতসব মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প রচনা করা হয়েছে, তাদের নিজ জন্মস্থানের গণমানুষের কাছে গল্প-রচয়িতারা যে নামেরই হোক, তারা মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের বিগত দুটো সরকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখে স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে সরকার গঠন করলেন এবং উক্ত সরকারের তিনিই ছিলেন প্রধান। বর্তমানে যারা যুদ্ধাপরাধের বিচার চাইছেন এবং সেক্টর কমাণ্ডার ফোরাম গঠন করে এর নেতৃত্বে রয়েছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তদানীন্তন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের আশেপাশে ছিলেন। মেজর জেনারেল (অব:) কে এম সফিউল্লাহ ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান এবং এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার ছিলেন বিমান বাহিনীর প্রধান। অন্যরাও তদানীন্তন সামরিক বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ১৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নাম যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করে যখন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমানকে জানানো হলো, তখন বর্তমান সেক্টর কমাণ্ডার ফোরাম এর সম্মানিত নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ কেনো জামায়াত নেতৃবৃন্দের নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় সরকারকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করালেন না?

কারণ তদানীন্তন সরকার ও সরকার প্রধান, মন্ত্রী পরিষদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ পরিপূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, বেসামরিক কোনো লোককে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত করা যায় না। করলে সমগ্র বিষয়টিই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। সে সময় সরকারে যারা ছিলেন, সরকার প্রধানকে কেন্দ্র করে যারা আবর্তিত হতেন এবং সরকারের গুণমুগ্ধ ছিলেন, তাদের মধ্যকার লোকজনই বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে গঠিত সংগঠনসমূহের নেতৃত্বে রয়েছেন। তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে, তদানীন্তন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকাভুক্ত না করে কি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন লংঘন করেছিলেন?

সেক্টর কমাণ্ডার ফোরাম নেতৃবৃন্দ ইদানিং বলছেন জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। প্রমাণ যদি তাদের হাতে থেকেই থাকে, তাহলে সে প্রমাণসমূহ তারা কেনো সে সময় বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের হাতে তুলে দেননি?

১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাষ্টের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সুযোগ ছিলো না বলে যদি দাবী করা হয়, তাহলে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে জুন মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন সরকার গঠন করে, একটানা পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করলো এবং প্রশাসনও ছিলো সম্পূর্ণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে, তখন কেনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী উঠলো না? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের পিতামাতার হত্যাকারীদের বিচার করলেও কেনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

www.pathagar.com

করলেন না, এ কৈফিয়ত কেনো তাঁর কাছে চাওয়া হলো না? এখন যারা জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলছেন, তখন তাদেরই সরকার ক্ষমতায় ছিলো এবং সেনাবাহিনী প্রধানও ছিলেন বর্তমান সেক্টর কমাণ্ডার ফোরামের আহ্বায়ক লে. জে. (অব:) এম হারুন আর রশিদ। কেনো তখন তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করেননি?

২০০১ সালে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির মিলিত নির্বাচনের ফলাফল এবং তাদের ৫ বছরের শাসনামলের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখার পর থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী তোলা হয়েছে, কেনো এবং কোন্ উদ্দেশ্যে তা বিচারের দাবীদারগণ গোপন রাখলেও দেশের সচেতন মানুষের কাছে গোপন নেই বরং দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ও জনগণের ওপর এর প্রভাব

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বিশেষ বলয়ের রাজনীতিবিদ, লেখক কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যরা দেশের ইসলামপন্থী বৃহৎ দলটি ও এর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীসহ নানা ধরনের অভিযোগ সভা-সমাবেশ, গল্প, কবিতা-সাহিত্যে এবং মিডিয়াতে নাটক, সিনেমায় প্রচার করে আসছে। অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ প্রচার করা হচ্ছে, তাঁরাও এদেশের জনগণের দৃষ্টির আওতায় রয়েছেন এবং সাধারণ জনগণও তাদের সকল কর্মকাণ্ড দেখছে। অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে তাঁরা নিজ এলাকার জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখছেন, এলাকার লোকদের বিপদে, দুঃখে-কষ্টে তাঁরা পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন।

যে এলাকায় তাঁরা বসবাস করেন, সেই এলাকার লোকজন তাদের চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যও দেখছেন। নিকটতম প্রতিবেশী ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও তাদের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এলাকার লোকজন নির্বাচনকালে তাদেরকে ভোট দিয়ে এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান এমনকি এমপি নির্বাচিত করে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে মন্ত্রীও বানিয়েছেন। এটাই সারা দেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে জনমতের অটল বাস্তবতা। বছরের পর বছর তাদের বিরুদ্ধে প্রচারের সকল মাধ্যম ব্যবহার করেও কি জনমত তাদের বিরুদ্ধে নেয়া সম্ভব হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে বিগত নির্বাচনী ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

'৮৮ এর নির্বাচনী ফলাফল কি বলে

জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগসহ নানাবিধ অভিযোগ তোলা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যাই বলে দেয় দীর্ঘ এবং সংঘবদ্ধ প্রচারের পরেও জনমত তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা সম্ভব হয়নি। বরং তাদের আদর্শিক সৌন্দর্য্যের কারণে জনমত তাদের পক্ষে ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, সদ্য

www.pathagar.com

সমাপ্ত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮- এর নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে এবং সারা দেশে মোট ৩৮টি আসনে দলীয় প্রতিক দাঁড়িপাল্লা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে ডিজিটাল কারচুপি করা সত্ত্বেও প্রতিটি আসনে আসন প্রতি প্রাপ্ত গড় ভোট ছিলো ৮৬ হাজার ২৭৫টি। ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আসন প্রতি জামায়াতের প্রাপ্ত গড় ভোট ছিলো ৭৫ হাজার ৮৬২টি।

এবারের নির্বাচনে জামায়াত তাদের প্রতিটি আসনে গত নির্বাচনের তুলনায় গড়ে ১১ হাজার ভোট বেশী পেয়েছে। গত নির্বাচনে দলটি মোট ভোট পেয়েছিলো ২৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৭৪টি। এবারের নির্বাচনে জামায়াতের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৫৯টি। গত নির্বাচনে জামায়াতের কয়েকজন প্রার্থী জামানত রক্ষা করতে পারেননি, এবারের নির্বাচনে ৩৮ জন প্রার্থীর কেউ-ই জামানত হারাননি। নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কিছু ভুল তথ্য প্রকাশ করলেও পরে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। অপরদিকে জোটবদ্ধ নির্বাচন করার কারণে জামায়াত নির্বাচন করেছিলো ৩৮ টি আসনে এবং ২৬২ টি আসনে বিএনপিকে সমর্থন করেছিলো। ২৬২ আসনেও রয়েছে জামায়াতের লক্ষ লক্ষ ভোটার। ঐসব ভোটের হিসাব এই পরিসংখ্যানে নেই।

ভোটের উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করার পরেও তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস না পেয়ে ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এতে প্রমাণ হয়, জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের গুরুত্ব দিচ্ছে না বাংলাদেশের জনগণ। কারণ তারা কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে দেখছেন সেই সাথে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগও নেতৃবৃন্দের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দকে জনগণ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, আল্লাহভীরু, সৎ ও দুর্নীতি মুক্ত হিসেবেই বিবেচনা করে থাকেন।

৩৮ বছর পরে কেনো এই দাবী?

স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনের নানা পর্যায়ে আওয়ামী লীগ জামায়াতের সাথে যোগাযোগ করে এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে এসে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে তারা বৈঠকও করেছে। আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা কর্মী তাদের ছেলেমেয়েকে জামায়াতের লোকদের ছেলেমেয়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় ও ১৯৯১ সনের পরে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় পার্লামেন্টে বা রাজপথে জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কোনো

www.pathagar.com

প্রশ্ন তুলেনি। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যখন জামায়াতের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেছেন, তখন কেনো সেক্টর কমাণ্ডার ফোরামের নেতৃবৃন্দ কেনো প্রতিবাদ করেননি তা জাতিকে জানাবেন কি?

বিভিন্ন কুটনৈতিক মিশনের দাওয়াতে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হাত মিলিয়ে পাশাপাশি বসে একত্রে আহার করেছেন, তখন কেনো সেক্টর কমাণ্ডার ফোরামের নেতারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন তা অনুগ্রহ করে জাতিকে জানাবেন কি?

১৯৯৬ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় যখন জামায়াতের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কাছে তার দলের এমপিদের সমর্থনের আশায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দোয়া চাইতে এসেছিলেন, তখন সেক্টর ফোরামের নেতারা কোথায় ছিলেন?

আসলে গরজ বড় বালাই, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির নীল নকশা অনুযায়ী কাজ না করলে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া যাবে না বিধায় জাতিকে বিভক্ত করার আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড ব্যতীত তারা দেশ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন না। নানা ধরণের প্রলোভন দেখিয়েও যখন জামায়াত- বিএনপি পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা গেলো না এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াত জোটবদ্ধভাবে জাতিয়তাবাদী শক্তি বিএনপির সাথে থাকলো ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে রাষ্ট ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হলো না, তখন থেকেই প্রবল আক্রশে দেশের বাইরের শক্তির নীল নকশা অনুযায়ী জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রচার করা শুরু হলো।

ইতোপূর্বে পুজিবাদের ধারক সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্যে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামপন্থীদেরকে যোগ্য শক্তি মনে করতো এবং এ কারণেই সে সময় তারা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশমান তৎপরতা পরিচালিত করেনি। সমাজতন্ত্রের তুলনায় ইসলামকেই তারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে অধিক হুমকি বলে মনে করলেও সমাজতন্ত্রের পতনের পূর্ব পর্যন্ত পুজিবাদি গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থেই প্রকাশ্যে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে তেমন বিরোধীতা করেনি। কিন্তু নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের পতনের পর থেকেই তারা ইসলামকেই একমাত্র টার্গেট করে পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামপন্থীদের নির্মূল করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

পরাশক্তি নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিশেষ একটি মহলকে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামপন্থীদের লেবাস পরিয়ে তাদের দ্বারা পৃথিবীর দেশে দেশে বোমা হামলা চালিয়ে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে কল্পিত আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোরআন সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে এটি সন্ত্রাসবাদের উৎস, মসজিদ-মাদ্রাসা সন্ত্রাসের সুতিকাগার, নবী করীম (সাঃ) কে সন্ত্রাসীদের নেতা হিসেবে উত্থাপন করা হচ্ছে (না'উযুবিল্লাহ), দাড়ি-টুপি দেখলেই সন্ত্রাসীদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। ঠিক এই অবস্থায় স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরে বাংলাদেশ থেকে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই সোসালিষ্ট ও সেক্যুলারিষ্টদের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধের ধুঁয়া তোলা হয়েছে।

আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয়

রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য বা শুধু জামায়াত নেতা আল্লামা সাঈদীর মূল পরিচয় নয়, জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচয় তিনি পবিত্র কোরআনের খাদেম বা মুফাস্সীরে কোরআন। ২০০৬-এর ৭ই অগাষ্ট লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকার ৪৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা সাঈদী সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "পৃথিবীর প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলে, বাংলাভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে যিনি গত চল্লিশ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে কোরআনের দাওয়াত পৌছানোর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের কালের একজন বড় মাপের কোরআনের পণ্ডিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

শুধু বাংলাভাষা কিংবা বাংলাদেশের কথাই বা বলি কেনো, আমাদের ইতিহাসে খুব কম মানব সন্তানই সুদীর্ঘ ৪ দশক ধরে এই অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অবস্থান করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। এদিক থেকে গোটা বিশ্ব পরিমণ্ডলে আল্লামা সাঈদী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মাঠে- ময়দানে, পত্র- পত্রিকায়, সেমিনার- সিম্পোজিয়ামে, রেডিও- টেলিভিশনে এক সুদীর্ঘকাল ধরে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের তাফসীর পেশ করার ক্ষেত্রেও আল্লামা সাঈদীর বিকল্প কোনো ব্যক্তি আজকের মুসলিম বিশ্বে আছে কিনা সন্দেহ।" লণ্ডনের সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত এ লেখাটি আরো লম্বা। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আল্লামা সাঈদী সম্পর্কিত সম্পূর্ণ লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হলো না।

তবে আল্লামা সাঈদীর পবিত্র কোরআনের খেদমতের সাক্ষী ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সবুজ শ্যামল এই বাংলাদেশ। তিনি চট্টগ্রামস্থ প্যারেড ময়দানে প্রতি বছর পাঁচদিন ধরে তাফসীর করেছেন টানা ২৮ বছর। সিলেট সরকারী মাদ্রাসা মাঠে একটানা ৩০ বছর। ঢাকা শহরে ইসলামী পাঠাগার আয়োজিত কমলাপুর রেলওয়ে মাঠ, মতিঝিল গভ: হাইস্কুল মাঠ ও পল্টন ময়দান মিলে ৩২ বছর। এ ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশের সবক'টি জেলা ও বিভাগীয় শহর। বাংলাদেশের এমন একটি জনপদও নেই যেখানে **'আল্লামা সাঈদী'** নামটি অপরিচিত।

নিজ জন্মভূমি পিরোজপুরে যখন তিনি প্রবেশ করেন এখান কার হিন্দু-মুসলিম নর-নারী

www.pathagar.com

জাতিধর্ম- দলমত নির্বিশেষে তাঁর কাছ থেকে নসিহত শোনার জন্য, তাঁর কাছ থেকে দোয়া নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষামান থাকেন। আল্লামা সাঈদীর এ আকাশ চুম্বী জনপ্রিয়তায় দিশেহারা তাঁর আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। তাই তাঁকে জনগণ থেকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী নানাবিধ অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালার অপরিসীম মেহেরবানীতে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। তার চাক্ষুষ প্রমাণ; যেখানেই আল্লামা সাঈদীর মাহফিল সেখানেই বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো জনতার ঢল, এ দেশে কি বিদেশে একই দৃশ্য সমগ্র বিশ্বময়।

মুক্তিযুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা

আল্লামা সাঈদী ১৯৭৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী ছিলেন না এবং মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর কোনো বিতর্কিত ভূমিকাও ছিলো না এ কথা তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন তাফসীর মাহফিলে বহুবার ঘোষণা করেছেন। শুধু ঘোষণাই দেননি, একাধিকবার পত্রিকার মাধ্যমে Open challenge করেছেন। তিনি দেশের সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও সংবাদকর্মীদের তাঁর নিজ এলাকা পিরোজপুরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেনো তারা সেখানে গিয়ে তদন্ত করে দেখে মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর কোনো স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকা ছিলো নাকি।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ পর্যন্ত অপবাদ আরোপকারীদের একজনও তাঁর Open challenge গ্রহণ করে সাহসিকতার পরিচয় না দিয়ে মিডিয়ায় তাঁকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে সেই পুরনো ভাংগা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। অভিযোগকারীরা বলে থাকেন, তিনি ১৯৭১ সালে পিরোজপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করেছেন। প্রকৃত সত্য হলো, দেশজুড়ে যুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক আলেম শহীদ হয়েছেন, কারাবন্দী হয়েছেন বা আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু আল্লামা সাঈদী যেহেতু স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল বদর বা শান্তিবাহিনীর কোনো সদস্যও ছিলেন না তাই তাঁকে কারাবন্দী হতে হয়নি বা আত্মগোপনও করতে হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম তাফসীর ও সীরাত মাহফিল শুরু করেন, এটাই প্রকৃত ইতিহাস।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এর মাত্র দুই মাস সাতদিন পর ১৯৭২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী আল্লামা সাঈদী তাঁর নিজের জেলা পিরোজপুর শহরে সীরাত মাহফিলে ওয়াজ করেন। এরপর থেকে সমগ্র দেশব্যাপী একটির পর একটি মাহফিলে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। এদেশের মানুষের মুখে মুখে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে একটি নাম, **'মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।'**

www.pathagar.com

১৯৭১ সনে পাকবাহিনীর সহযোগী হিসেবে তিনি যদি নিজ এলাকায় অত্যাচার করে থাকেন, তাহলে সেই এলাকারই জনগণ বিজয় দিবসের মাত্র ২ মাস ৭ দিন পরে প্রধান অতিথি হিসেবে সীরাত মাহফিলে তাঁকে কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলো? মাত্র ২ মাস ৭ দিনের ব্যবধানে এলাকার লোকজন তাঁর অত্যাচারের কথা ভুলে গেলো? একজন অত্যাচারী রাজাকারের মুখ থেকে এলাকার লোকজন কোরআন- হাদীসের কথা শুনলো? তিনি যখন উক্ত মাহফিলে কোরআনের কথা বলছিলেন তখন কি এলাকার কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবিত ছিলেন না? শ্রোতা মণ্ডলীর মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে কেউ একজনও কেনো প্রতিবাদ করলো না, আপনি রাজাকার ছিলেন আপনার বক্তব্য শুনবো না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হেজাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে ১৯৭২ সনে পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ (যাদের অধিকাংশই এখন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন) পাবনা ষ্টেডিয়াম ময়দানে ৭ দিনব্যাপী কোরআন তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করে আল্লামা সাঈদী সাহেবকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিলেন। পাবনার তদানীন্তন অমুসলিম এসপি মাহফিলে বাধা দিলে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বাধা উপেক্ষা করে তাফসীর মাহফিল সফল করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছিলেন, 'বুকের তপ্ত শোণিত ধারা অকাতরে ঢেলে দিয়েছি, বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কারো গোলামী করার জন্য রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে আসিনি। প্রয়োজনে বুকের শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিয়ে হলেও কোরআনের মাহফিল বাস্তবায়ন করবো।' সাত দিনব্যাপী মাহফিল তারা সফল করেছিলেন।

পাবনার উক্ত মাহফিলে আল্লামা সাঈদীকে বরণ করে নেয়ার দৃশ্য ছিলো বড়ই চমৎকার। অস্ত্র হাতে প্রহরারত পথের দু'ধারে দেশ ও জাতির অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধার দল। অগণিত মোটর সাইকেলে বিউগল বাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধাগণ পথের দুই পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর মাঝখানে আল্লামা সাঈদীকে নিয়ে গাড়ী বহর এগিয়ে যাচ্ছিলো মাহফিলের মঞ্চের দিকে। গাড়ি তাঁকে বহন করে ধীর গতিতে মঞ্চের কাছে পৌছতেই একুশ বার তোপধ্বনি দিয়ে আল্লামা সাঈদীকে বরণ করে নিলেন অপেক্ষমান বীর মুক্তিযোদ্ধারা। এই অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা যে সকল মুক্তিযোদ্ধাগণ করেছিলেন এবং মাহফিলে অগণিত শ্রোতা যারা ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই কালের সাক্ষী হয়ে এখন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। তিনি যদি স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারই হবেন তাহলে পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কেনো তাকে তোপধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নিয়েছিলেন?

বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা বা উল্লেখ যোগ্য থানা নেই যেখানে তিনি তাফসীর মাহফিল করেননি, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি মাহফিলে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাগণ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন মাহফিল সমূহে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, এমপি, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিচারপতি, সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণও মঞ্চে আসন গ্রহণ করে বক্তব্য শুনেছেন, বহু সংখ্যক মাহফিলে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকগণও বক্তব্য রেখেছেন।

www.pathagar.com

বিদেশের স্কলারগণ মাহফিলে এসে বক্তব্য রেখেছেন, এমনকি পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মানিত ইমাম চট্টগ্রামে তাঁর তাফসীর মাহফিলে দুই বার তাশরীফ এনেছেন।

১৯৭৯ সালে নারায়নগঞ্জ চিলড্রেন পার্কে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলের উদ্বোধনী দিবসে **স্বাধীনতার মহান ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান** আল্লামা সাঈদী সাহেবের পাশে বসে ঘন্টাকাল তাঁর তাফসীর শুনেছেন নারায়নগঞ্জবাসী আজও তার সাক্ষী। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমাণ্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলীল সাহেবের সাথে আল্লামা সাঈদী সাহেবের ছিলো অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, উভয়ে উভয়ের বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

তাছাড়া ৮০'র দশকে ঢাকা হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গনে তিনি প্রায় প্রতি বছর মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। দেশের প্রধান বিচারপতিসহ হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ মুগ্ধ চিত্তে ঘন্টার পর ঘন্টা আল্লামা সাঈদীর বক্তব্য শুনেছেন এবং এসবের ভিডিও চিত্রও রয়েছে। আল্লামা সাঈদী যদি ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকা পালন করতেন তাহলে কি রাষ্ট্রপ্রধানসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এসব দেশবরণ্য ব্যক্তিবর্গ কি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাঁর মাহফিলে অংশগ্রহণ করে পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনতেন?

আল্লামা সাঈদীর নির্বাচন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

বিশ্ববরেণ্য মুফাস্সীরে কোরআন আল্লামা সাঈদী তাঁর নিজ এলাকা চির অবহেলিত পিরোজপুরের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে পিরোজপুর-১ আসনে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। ২০০১ সালে পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ২০০৮ সালের ডিজিটাল কারচুপির নির্বাচনে তাঁকে পরিকল্পনা মাফিক হারিয়ে দেয়া হয়। ২০০১ সালে আল্লামা সাঈদী নির্বাচিত হয়ে নিজ এলাকা পিরোজপুরে প্রায় ৪০০ শত কোটি টাকার যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, পিরোজপুরবাসী ইতোপূর্বে তা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি।

পিরোজপুর-১ আসনে মোট ভোটারদের ২৫ ভাগ হিন্দু ভোটার। উক্ত তিনটি নির্বাচনেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার লোকজন তাঁকে ভোট দিয়েছেন। এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সক্রিয়ভাবে তাঁর নির্বাচনে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন। তাঁর নির্বাচনে যে সকল সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নির্বাচন পরিচালনা করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট (মরহুম) শহীদুল আলম নিরু (পিরোজপুর সদর)

২. বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী নুরুজ্জামান বাবুল (সাবেক সংসদ সদস্য)

www.pathagar.com

৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা এম, ডি লিয়াকত আলী শেখ বাদশাহ (সাবেক পৌর চেয়ারম্যান, পিরোজপুর)

৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক মুনান (সাবেক পৌর কমিশনার, পিরোজপুর)

৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বাতেন (পৌর কমিশনার, পিরোজপুর)

৬. বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকাররম হোসেন কবির (ম- ১৬৩৯, পাড়েরহাট- জিয়ানগর)

৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গণী মোল্লা (গেজেট নং ২৫৩৪, জিয়ানগর)

৮. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম হাওলাদার (গেজেট নং ২৫২৮, জিয়ানগর)

৯. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই মীর (ম- ১১৯২৫৪, জিয়ানগর)

১০. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব মোল্লা (ম- ৭৮২৬৫, জিয়ানগর)

১১. বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেব সেপাই (গেজেট নং ২৫৪৬, জিয়ানগর)

১২. বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মাদ হাওলাদার (গেজেট নং ২৪৮৫, জিয়ানগর)

১৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট শেখ আব্দুর রহমান (নাজিরপুর)

১৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবীবুর রহমান বাহাদুর (নাজিরপুর)

আল্লামা সাঈদী যদি তাঁর নিজ এলাকায় বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হতেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে যদি তাঁর বিতর্কিত ভূমিকা থাকতো এবং তিনি যদি যুদ্ধাপরাধী হতেন তাহলে তাঁর নিজ এলাকার এতোসব বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কি নিঃস্বার্থভাবে সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে তাঁকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অংশ নিতেন? সুতরাং রাজধানীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেলের কক্ষে বসে টক্-শোর মাধ্যমে পরিবেশ তিক্ত করা এক জিনিস আর বাস্তবতা ভিন্ন জিনিস।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ও আল্লামা সাঈদী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দেশী- বিদেশী ৭৬ টি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে কট্টর বামপন্থী লেখকদের মাত্র দুই চারটি গ্রন্থে কোনো ধরণের উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীতই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজাকার হিসেবে আল্লামা সাঈদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এসব গ্রন্থের কোনোটিতে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে, কোনোটিতে জামায়াতে ইসলামী, আল বদর রাজাকারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোনোটিতে নাম উল্লেখ করা হলেও কোনো প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি। কোনোটিতে জামায়াতের নামও উল্লেখ করা হয়নি। কোনোটিতে মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী, পাকবাহিনী ও তার দালালদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলেও জামায়াত সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি। কোনোটি কল্পনা

www.pathagar.com

নির্ভর উপন্যাসের মতো করে রচনা করা হয়েছে। কোনোটি মুক্তিযুদ্ধ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। নীচে কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

১. **দিপু সরোয়ার** রচিত **'ফিরে দেখি ঘাতকের চেহারা'** নামক গ্রন্থে আল বদর বাহিনীর নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে এবং এই তালিকার মধ্যে আল্লামা সাঈদী সাহেবের নাম উল্লেখ করে ব্রাকেট দিয়ে লেখা হয়েছে , 'যিনি সরাসরি আল বদর বাহিনীর তত্ত্বাবধানে না থাকলেও মানসিকভাবে ছিলেন আল বদর'। সম্পূর্ণ হাস্যকর কথাটি লিখে লেখক সমগ্র গ্রন্থটিকেই হাসির খোরাকে পরিণত করেছেন।

২. **নীল কমল বিশ্বাস** লিখিত **'বাংলাদেশের রাজনীতিঃ একাত্তর থেকে আটানব্বই'** নামক গ্রন্থের ৩০৯ পৃষ্ঠায় অভিযুক্তের তালিকায় আল্লামা সাঈদী সাহেবকে রাজাকার হিসেবে উল্লেখ করা হলেও কোনো তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

➡ **রফিকুল ইসলাম** বীর উত্তম লিখিত **'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ- ১৯৭১'** নামক গ্রন্থে ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের কৌশল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানী বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এ গ্রন্থে আল্লামা সাঈদী সম্পর্কে কোনো আলোচনা আসেনি।

➡ **বদর উদ্দিন উমর** লিখিত **'বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার'** নামক গ্রন্থে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বারের পর থেকে দালালদের হত্যা, পরবর্তীকালে সাধারণ ক্ষমা ও যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডকে নাটক হিসেবে উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

➡ সেক্টর কমাণ্ডার কর্ণেল (অব.) **কাজী নুর-উজ্জামান'** লিখিত **'মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজনীতি ও তাদের প্রাপ্য সম্মান না দেয়ার কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

➡ **হায়দার আকবর খান** রনো লিখিত **'শতাব্দী পেরিয়ে'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি তুলে ধরে আওয়ামী সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে।

➡ **গোলাম মতুর্জা** লিখিত **'শান্তি বাহিনী গেরিলা জীবন'** নামক গ্রন্থে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **'নির্যাতিত ও অভিশপ্ত দি টর্চার্ড এণ্ড দি ড্যাম্‌ড'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু জামায়াত সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

www.pathagar.com

➡ **আতাউস সামাদ** লিখিত **'তবু বলে যাই'** নামক গ্রন্থে জীবনের স্মৃতিময় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **আওলাদ হোসেন খান** লিখিত **'পতাকার ইতিবৃত্ত'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ও পতাকার উত্থানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **মেজর কামরুল হাসান** লিখিত **'স্বাধীনতা'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব কথা আলোচনা করা হয়েছে, রাজাকারদের কথা উল্লেখ থাকলেও আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **সাঈদ হাসান দারা** লিখিত **'সৈনিকটি এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে'** নামক গ্রন্থটি অনেকটা কাল্পনিক উপন্যাসের মতো।

➡ **মুনতাসীর মামুন** লিখিত **'যেভাবে এখন চলছে বাংলাদেশে'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই এবং আল্লামা সাঈদীর নামও নেই।

➡ **সুফিয়া কামাল** লিখিত **'মুক্তিযুদ্ধে মুক্তির জয়'** নামক গ্রন্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইন্দিরা ও ভারতের সম্পর্কে ও বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং রাজাকারদের সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও নির্দিষ্ট কারো নাম নেই।

➡ **জানে আলম** লিখিত **'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ'** নামক গ্রন্থে মৌলবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

➡ **সাদ্দাদ বাহাদুর** লিখিত **'গণহত্যা ও বধ্যভূমি' ৭১'** নামক গ্রন্থে রাজাকারদের অপকর্ম, কয়েকজন রাজাকারের নাম এবং শান্তি কমিটির লোকদের নাম উল্লেখ করা হলেও আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন** সম্পাদিত **'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)'** নামক গ্রন্থে বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরা হলেও তেমন কোনো রাজনৈতিক দলকে পক্ষে- বিপক্ষে দেখানো হয়নি।

➡ **আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন** সম্পাদিত **'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (২য় খণ্ড)'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকা রয়েছে, কিন্তু আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের নাম নেই।

➡ **আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন** সম্পাদিত **'মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (৩য় খণ্ড)'** নামক গ্রন্থে রাজাকার ও শান্তি কমিটি গঠন ও এর নেতৃত্বে যারা ছিলো তাদের কর্ম ও নাম উল্লেখ করে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

www.pathagar.com

➡ **অধ্যাপক আবু সাঈদ** লিখিত **'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে সিক্রেট ডকুমেন্ট'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, রাজাকারদের ও স্বাধীনতা বিরোধী অনেকের নাম উল্লেখ করা হলেও আল্লামা সাঈদী সাহেবের নাম নেই।

➡ **বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর** লিখিত **'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও অন্যান্য প্রবন্ধ'** নামক গ্রন্থে দালাল আইন, মোশতাক- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

➡ **খুরশিদ আলম সাগর** লিখিত **'রণাঙ্গনে মুক্তি সেনা'** নামক গ্রন্থে বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরা হলেও তেমন কোনো রাজনৈতিক দলকে পক্ষে- বিপক্ষে দেখানো হয়নি।

➡ কর্ণেল (অব.) **মোহাম্মাদ সফিকুল্লাহ,** বীর প্রতীক লিখিত **'মুক্তিযুদ্ধে আট নম্বর সেক্টর'** নামক গ্রন্থে জামায়াত, রাজাকার, শান্তি কমিটি ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে, অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির ৩১৯ থেকে ৩২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আওয়ামী আমলে গঠিত রক্ষীবাহির নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন সম্পর্কে, নির্যাতনের চিত্র, নির্যাতিত কয়েকটি পরিবারের পরিচিতি এবং কয়েকটি এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দেয়া হয়েছে কিন্তু কোথাও কোনো অপরাধে জড়িত হিসেবে আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **রফিক আনোয়ার** লিখিত **'একাত্তরের বধ্যভূমি রাজাকারের বায়োস্কোপ'** নামক গ্রন্থটি উপন্যাসের মতো।

➡ **শাহরিয়ার কবির** লিখিত **'একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার'** নামক গ্রন্থে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে নানা কথা আলোচনা করা হলেও ৬১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "প্রায় ২০০ পাকিস্তানী সেনা-কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ চিহ্নিত করেছিলো যুদ্ধাপরাধী হিসেবে।" কিন্তু বইয়ের কোথাও আল্লামা সাঈদীর নাম নেই।

➡ **জাহানারা ইমাম** লিখিত **'একাত্তরের দিনগুলি'** নামক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আল্লামা সাঈদীর কথা নেই।

➡ **এ, এ, এম, সামসুল আরেফীন** লিখিত **'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান'** নামক গ্রন্থে শান্তি কমিটি, আল বদর, রাজাকার গঠনে যার যে ভূমিকা ছিলো তাদের নাম ও পদবী উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থেও আল্লামা সাঈদী সাহেবের নাম নেই।

উপরের বইগুলিসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত বইসমূহের

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করলে কোথাও আল্লামা সাঈদীর নাম পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলেছি, যে ২/১ টি বইতে নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন তারা করতে পারেনি।

পার্লামেন্টে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জ

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০'র দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত আল্লামা সাঈদী সাহেবকে কেন্দ্র করে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ৮০'র দশকের শেষ ভাগ তথা এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৯ সালে যখন আল্লামা সাঈদীকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য মনোনীত করার সংবাদ জাতিয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়; মূলত তখন থেকেই একটি মহল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইলোক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে যে, তিনি স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ছিলেন। পরপর দুই বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে, তিনি যুদ্ধাপরাধীও ছিলেন। এসব কিছুই যে তাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিম চেতনা বিরোধী শক্তির নীল নকশা অনুযায়ী ঘটছে এ বিষয়টি সচেতন জনগোষ্ঠীর নিকট দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

আল্লামা সাঈদী ১৯৯৭ সালের ২৪শে জুন পার্লামেন্টে বাজেট বক্তৃতার এক পর্যায়ে ড. কুদরতে খুদা প্রণীত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করছিলেন, তখন পার্লামেন্টের স্পীকার ছিলেন হুমায়ন রশীদ চৌধুরী। সেদিন পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ প্রায় সকল সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সাঈদী সাহেবের বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে একজন তাঁকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো 'রাজাকার'। সাথে সাথে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন, **"মাননীয় স্পীকার, আমাকে রাজাকার বলা হয়েছে। বাংলাদেশের এমন কোনো বাবার সন্তান নেই যে, আমাকে রাজাকার বলতে পারে। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী ছিলাম না। আমি রাজাকার নই, আমাকে রাজাকার বলে- যদি তা কেউ প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তার বিরুদ্ধে দশকোটি টাকার মানহানী মামলা দায়ের করবো। যারা ভারতীয় রাজাকার তারাই এ কথা বলতে পারে।"** তাঁর এই Challenge পার্লামেন্টে রেকর্ড হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। (তথ্য সুত্র: বাংলাদেশ জাতিয় সংসদের বিতর্ক' পুস্তকের ১৫০- ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ঐ বক্তব্য রেডিওর মাধ্যমে গোটা জাতি শুনতে পেয়েছে।)

www.pathagar.com

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদীর মানহানী মামলা

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা আল্লামা সাঈদীর নামে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বারবার বানোয়াট মিথ্যা ফিচার লিখতে থাকে। তিনি এর বিরুদ্ধে Open Challenge ঘোষণা করেন। পত্রিকাটি তাঁর বিরুদ্ধে লেখা ছাপানোর সময় তা প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইনে ছাপলো। আর তিনি যখন ওপেন চ্যালেঞ্জ করলেন, তখন তা ছোট্ট করে অষ্টম পৃষ্ঠায় ছাপানো হলো যেন পাঠকের চোখে না পড়ে।

১৯৯৭ সনের ৭ই অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠের ১৬ পৃষ্ঠায় হেডিং ছিল, **'সাঈদীর ওপেন চ্যালেঞ্জ'**। আল্লামা সাঈদী বলেছিলেন, **'আমি আমার দেশের সকল সাংবাদিক, সকল গোয়েন্দা বিভাগ, সকল বুদ্ধিজীবীদের আমার পিরোজপুরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার উপস্থিতিতে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার কোনো ভূমিকা ছিল, তাহলে আমি স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করবো।'**

কিন্তু এরপরেও জনকণ্ঠ পত্রিকাসহ কয়েকটি পত্রিকা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে কল্পিত কাহিনী প্রচার করতেই থাকে। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে জনকণ্ঠ পত্রিকার বিরুদ্ধে ২০০১ সালের মার্চ মাসে দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করেন। এ সংক্রান্ত সংবাদটি ২২/ ০৩/ ০১ তারিখের দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজকের কাগজ, দৈনিক মুক্তকণ্ঠসহ আরো অনেকগুলো পত্রিকায় বিভিন্ন শিরোণামে প্রকাশ করা হয়। ঢাকার প্রথম সাবজজ আদালতে জনকণ্ঠের সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, প্রতিবেদক জুলফিকার আলী মানিক এর বিরুদ্ধে আল্লামা সাঈদী মানহানির ক্ষতিপূরণের জন্যে দশকোটি টাকার মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-ঢাকার ১ম সাবজজ আদালাত মানিঃ মোঃ নং-১৪/২০০১। আদালত মামলা গ্রহণ করেন এবং এখন পর্যন্ত উক্ত মামলা বিচারাধীন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আল্লামা সাঈদীকে রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে লেখালেখি এবং তাঁর মাহফিলসমূহে বাধা দেয়ার প্রতিবাদ করে সে সময়ে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বনামধন্য সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মোবায়েদুর রহমান আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপকীদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। জনাব মোবায়েদুর রহমান সাহেব লিখেছেন, **"আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইস সাঈদী ইসলামী আন্দোলনের এক নিরলস সৈনিক। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা লাখ লাখ**

www.pathagar.com

মানুষকে তাঁর ইসলামী সমাবেশে আকর্ষণ করে। নামকরা নায়ক-নায়িকা যেমন সিনেমা হলে দর্শককে টানে, নামকরা কণ্ঠশিল্পী যেমন তার কণ্ঠসৌকর্যে শ্রোতাকে টানেন তেমনি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তৃতা ইসলামী সমাবেশে লাখো মানুষকে টানে। এদিক দিয়ে তাঁকে বলা যায়, 'স্টার স্পীকার'। সেই সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে তারা (জনকণ্ঠ পত্রিকা) '৯৭ সাল থেকে অনবরত বিষোদগার করে যাচ্ছে। '৯৭ সাল থেকে তারা সাঈদী সাহেবকে রাজাকার বলে গালাগালি করে আসছে। মাওলানা সাঈদী তাদের বিরুদ্ধে রাজাকারী অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, সাঈদী সাহেব কস্মিনকালেও পাক আর্মির সহযোগী ছিলেন না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তারা তাদের পুরানা রেকর্ড বাজিয়েই চলেছে। এবার এই ২০০১ সালে তারা চরম উস্কানীমূলক এক সিরিজ বের করছে। প্রতিদিন একজন করে আলেমকে বাছাই করা হচ্ছে এবং জঘন্য ও কুৎসিত ভাষায় তার চরিত্র হনন করা হচ্ছে। মাওলানা সাঈদীকে তারা এবারও আক্রমণ করেছে পুরাতন কায়দায়, ভাঙ্গা কলের গান বাজিয়ে, দালাল ও রাজাকারের জাবর কেটে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আতঙ্কজনক সেটা হলো, তারা এবার সহিংসতা 'রফতানী' করা শুরু করেছে। এক সময় চীনা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে 'বিপ্লব রফতানী' **(Export of Revolution)** করার অভিযোগ করেছিল পুঁজিবাদী বিশ্ব। তৎকালীন সেভিয়েট ইউনিয়নও এই অভিযোগে শামিল হয়। চীন বিরোধী 'একদা বাম ছিলেন' সিউডো কমিউনিষ্টরা এখন ভায়োলেন্স এক্সপোর্ট **(Violence export)** করা শুরু করেছে। অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ওরা সহিংসতা, নৈরাজ্য এবং নাৎসিবাদী ও ফ্যাসিবাদী হামলা ঢাকা থেকে মফস্বলে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইসলামী ব্যক্তিরা যেখানেই জনসভা বা সমাবেশ করবেন বলে ঘোষণা দেন সহিংসতা ও নৈরাজ্যের এসব প্রবক্তারা **(Prophet of Violence)** সেখানেই পাল্টা জনসভা বা সমাবেশ ডেকেছেন। এর ফলে অতীতে অসংখ্যবার দু'টি দলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এবং রক্তপাতও ঘটেছে। এসব ঘটনা অধিকাংশই ঘটেছে মাওলানা সাঈদীর সমাবেশকে কেন্দ্র করে। তবে ইসলামী দল বা ব্যক্তিত্বের সহনশীলতা এবং গোলমাল এড়ানোর মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়ানোতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে তাফসীর মাহফিল বা সমাবেশের ক্ষেত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, নৈরাজ্যবাদীরা বিদেশেও সংঘর্ষ ছড়িয়ে দিতে চায়। আলোচ্য পত্রিকাটিতে দেখলাম, ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য দেয়ার জন্য মাওলানা সাঈদী চলতি মাসের (২০০১ সনের মার্চ) দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে সভা করবেন। ঐ সভা প্রতিহত করার জন্য ঐ পত্রিকার মাধ্যমে সিডনীতে বসবাসরত বাংলাদেশীদেরকে উস্কানী দেয়া হচ্ছে।" (১৩/ ০৩/ ০১ দৈনিক ইনকিলাব দ্রষ্টব্য)

মূল পরিকল্পনা দেশের বাইরের

সমগ্র দেশের সচেতন মানুষ লক্ষ্য করে আসছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে, তারা পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও প্রকৃত ইসলামী শক্তিশালী দল ও প্রতিবাদী কণ্ঠ সহ্য করতে রাজী নয়। এ লক্ষ্যেই তারা পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী স্কলার আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, কাতারের আল্লামা ডক্টর ইউসুফ আল আল কারদাভী, মিশরের ডক্টর ত্বাহা রামাদ্বান, ভারতের ডক্টর জাকির নায়েকসহ অনেকের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইলোক্টনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়াগুলো ঘৃণ্য অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী আল্লামা সাঈদীর খ্যাতি তাঁর নিজের জন্য বোধহয় কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, বিগত অক্টোবর ২০০৮ সালে দুবাইয়ের ন্যাশনাল ঈদ গ্রাউণ্ডে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হোলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আল্লামা সাঈদীর বিশাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মাহফিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরব আমিরাতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শায়খ মোহাম্মাদ বিন রাশেদ আল মাকতুম। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এটি ছিলো উল্লেখযোগ্য গণজমায়েত। উপস্থিত অর্ধলক্ষাধিক দর্শক- শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিলো 'পবিত্র কোরআনের বিজ্ঞানময় মু'জিজা'। দুবাই সরকার তাঁর দুই ঘন্টার উক্ত বক্তব্য সিডি, ভিসিডি করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপ মাহফিল হলো সাউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে। জেদ্দা, তায়েফ, দাম্মাম এবং পবিত্র মক্কা- মদীনায়।

একই ধরনের মাহফিল হলো গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীর আলেকজান্দ্রা ষ্টেডিয়ামে, ইটালীর রাজধানী রোমে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে, জার্মানীর রাজধানী ফ্রাঙ্কফুর্টে, জাপানের রাজধানী টোকিওতে, কোরিয়ার রাজধানী সিউলে, অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে, থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে, সিঙ্গাপুরে, ইরানের রাজধানী

www.pathagar.com

তেহরানে এবং কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশে।

আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে অগণিত জনতার উপস্থিতির দৃশ্য সেসব দেশের টিভি চ্যানেলগুলোয় সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে। একই ধরনের মাহফিল হয়েছিলো আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সামনে ৪২ নং সড়কে (Fourty second street) এবং আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনসহ উক্ত দেশের ২২টি অঙ্গরাজ্যে। ইউরোপের ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনসহ গ্রেটবৃটেনের প্রায় সবগুলো শহরে তিনি বিগত ত্রিশ বছর ধরে মাহফিল করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১১টি দেশে তিনি সফর করেছেন। এভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটিতে, উত্তর গোলার্ধের কানাডার টরেন্টো ও মন্ট্রিয়েল ইউনিভার্সিটিসহ পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের অন্তত অর্ধশত দেশে তিনি মাহফিল করেছেন।

দেশে- বিদেশে ইসলামের পক্ষে সকল শ্রেণীর মানুষের অভূতপূর্ব এ গণজোয়ার দেখার পর থেকেই আল্লামা সাঈদীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ইর্ষান্বিত হয়ে দেশী-বিদেশী মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগের ঝড় তোলে।

তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক, তথ্য নির্ভর আকর্ষণীয় আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর মাহফিলে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসে নারী- পুরুষ, তরুণ- তরুণী, জাতি-ধর্ম দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার অগণিত মানুষ। আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে শুধু মুসলমানগণই অংশ গ্রহণ করে না, অসংখ্য অমুসলিম নারী পুরুষ তাঁর মাহফিলে অংশ গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন। দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত ছয় শতাধিক অমুসলিম আল্লামা সাঈদীর হাতে ইসলাম কবুল করেছেন। ইসলামী জীবনাদর্শ যাদের পছন্দ নয় বরং অসহ্য, তারাই আল্লামা সাঈদীকে জনবিচ্ছিন্ন করার হীন উদ্দেশ্যে তাঁকে রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী ও সবশেষে যুদ্ধাপরাধী বানানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বহুমুখী ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মিথ্যা, বানোয়াট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব জঘন্য ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ। দেশ প্রেমিক শান্তিকামী দ্বীন দরদী অসংখ্য মুসলিম নরনারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনয়াবনতভাবে একাগ্রচিত্তে সে দোয়াই করছে।

শেষ কথা

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ৮০'র দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত কতক পত্রিকায় ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা

www.pathagar.com

হয়েছে, তার প্রতিটি শব্দ, লাইন, প্রতিটি বর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানীর হিটলারের তথ্য মন্ত্রী ছিলেন গোয়েবলস, তার বিশ্ব বিখ্যাত একটি উক্তি এ রকম ছিলো যে, **"একটি মিথ্যা কথাকে শতবার উচ্চারণ করলে তা সত্যে পরিণত হয়।"**

আল্লামা সাঈদীর আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েবলসের সেই জগৎ কুখ্যাত হাতিয়ারটিই ব্যবহার করে নতুন প্রজন্মসহ গোটা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ভয় ও পরকালের জবাবদীহীতার প্রতি বিশ্বাস থাকলে কারো বিরুদ্ধে এমন মিথ্যাচার অন্তত: কোনো খোদাভীরু মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমরা দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

➡ মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, **"তুমি ঘোষণা দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা (চিরতরে) বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্য মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতেই হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮১)**

➡ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন, **"যে বিষয়ে তোমার কোনো (সুস্পষ্ট) জ্ঞান নেই (অযথা) তার পেছনে পড়োনা, কেননা (কিয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর এসব ক'টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল -৩৬)**

➡ পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, **"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! যদি কোনো ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরীক্ষা করে দেখবে (কখনো যেন আবার এমন না হয়) না জেনে (শোনা কথায় বিশ্বাস করে) তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হলো।" (সূরা হুজুরাত- ৬)**

www.pathagar.com

পিরোজপুরের স্বনামধন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ

মাওলানা সাঈদী

সম্পর্কে যা বলেন ঃ-

★ নির্ভরযোগ্য একাধিক সুত্রে জানা যায় **মহান মুক্তিযুদ্ধের নবম সাব-সেক্টর কমাণ্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়া উদ্দিন (অব.)** বলেছেন ঃ-

"১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা সাঈদী স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। এসবের তালিকায় কোথাও তাঁর নাম নেই।"

একইভাবে

- বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী নুরুজ্জামান বাবুল (সাবেক সংসদ সদস্য)
- বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. ডি. লিয়াকত আলী শেখ বাদশাহ্ (সাবেক পৌর চেয়ারম্যান)
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক মুনান (সাবেক পৌর কমিশনার)
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বাতেন (পৌর কমিশনার)

তাঁরা বলেছেন

"আল্লামা সাঈদী আমাদের পিরোজপুরের কৃতিসন্তান এবং আধুনিক পিরোজপুর গড়ার রূপকার। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল বদর, আল শাম্‌স, শান্তি কমিটির সদস্য বা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ এর তথা সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁকে বিজয়ী করার জন্য আমরা তাঁর সাথে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। পিরোজপুর এলাকাবাসী এর সাক্ষী।"

পিরোজপুরের প্রখ্যাত হিন্দু নেতা বাবু ধীরেন্দ্র দত্তর মন্তব্য

২০০৫ সালে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত জেলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বাবু ধীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন–

"মায়ের পেটে বাচ্চা থাকে যেমন নিরাপদে আমরা পিরোজপুরের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় মাওলানা সাঈদীর আমলে সেভাবে পরম শান্তিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করছি।"